স্বাধীনতা শব্দটির মানে মনে মনে আমরা সবাই জানি। না জানলেও কেমন করে যেন বুঝে ফেলি। শব্দটা একটা দেশের জন্য, সে দেশের মানুষের জন্য খুব জরুরি আর প্রিয় একটা শর্ত। আমাদের দেশটা আমাদেরই ভুখন্ড আর কারোর নয়, আর আমরা আমাদের দেশেরই নাগরিক। কিন্তু এমনটা সবসময় ছিল না। স্বাধীনতাকে পেতে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে টানা নয় মাস।

৭১ সালের ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষন দেন, সেই ভাষনে সারা বাংলার মানুষ একসাথে কেবল একটাই স্বপ্ন দেখা শুরু করল, সেই স্বপ্নের নাম 'স্বাধীনতা' আর 'মুক্তি'।

স্বপ্ন সবাই চোখ বুজেই দেখে কিন্তু যে স্বপ্ন মানুষ খোলা চোখে দেখে সেই স্বপ্নের বীজ বোনা থাকে মনে। দিনে দিনে তাকে সত্য করতে যাকিছু করার মানুষ তার সবকিছুই করে। যারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নের জন্য যুদ্ধ করেছেন, শহিদ হয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু অনেক কিশোর মুক্তিযোদ্ধাও ছিল। আমরা আমাদের বাংলা বই থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেও আনেক কিছু জানতে পারব। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানাতে আমরা এবার একটা কাজ করি চল। সে কাজটির নাম দিলাম **চলো নকশা হই**।

কাগজে কলমে নকশা আঁকাতো আমরা শিখলাম এবার আমরা চেস্টা করব নিজেদের শরীরকে ব্যবহার করে আমরা তৈরি করতে পারি নানা রকমের নকশা। জাতীয় দিবসসহ নানা রকম অনুষ্ঠানে আমরা মানব শরীরকে ব্যবহার করে নানা ধরনের নকশা উপযোগী ডিসপ্লে (display) দেখতে পাই।

চলো নকশা হই—

- শরীর দিয়ে নকশা তৈরির জন্য আমরা প্রথমে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাব।
- বিভিন্ন রকম নকশা দেখে, একেকটি দল একেকটি নকশা নির্বাচন করব। জেমন- ত্রিভূজ , বৃত্ত, ঢেউ, শাপলা ফুল, স্মৃতিসৈয়াধ, ইত্যাদি।
- মাটিতে বেশ বড় করে সে নকশাটি এঁকে নিব। সেটা চক হতে পারে কিংবা কাঠি বা ইটের টুকরা, মাটির পাত্রের ভাঙা অংশ দিয়ে এঁকে নিতে পারি।
- এবার সে নকশা অনুযায়ী সবাই দাঁড়াব। এভাবে আমরা নকশা বানানোর অনুশীলন করব শরীর দিয়ে। সেটা আমরা নকশার উপরে দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে পড়েও করতে পারি।
- চূড়ান্তভাবে আমরা এটি তৈরি করব কোনো রকমের নকশা না এঁকে না নিয়ে শুধু নিজেদের শরীরগুলোকে ব্যবহার করে।
- চূড়ান্ত প্রদর্শনের সময় আমরা নির্বাচিত স্থানে (যেখানে চূড়ান্ত প্রদর্শনী হবে) একেকটি দল একটা নকশা হব, কিছুক্ষণ থেকে বের হয়ে যাব, আবার আরেকটি দল আসবে তারাও অন্য একটি নকশা প্রদর্শন করবে। এভাবে প্রতিটি দল তাদের নকশা উপস্থাপন করবে।
- নকশা প্রদর্শনের সময় আমরা হাতে তালি দিয়ে ১,২,৩ গুনে একটি তাল তৈরি করে তার সাথে নিচের স্বরগুলকে পুনরাবৃত্তিক (repetitive) ভাবে গেয়ে ও বাজিয়ে তার সাথে আমরা display করতে পারি।

সা রে গা, রে গা মা, গা মা পা

মা পা ধা, পা ধা নি, ধা নি র্সা

র্সা নি ধা, নি ধা পা, ধা পা মা

পা মা গা, মা গা রে, গা রে সা

তাছাড়া স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের ভাবনাকে আমরা ছবি এঁকে অথবা সৃজনশীল লেখার মাধ্যমেও প্রকাশ করতে পারি, **চলো নকশা হই** প্রদর্শনীর দিন আমরা আমাদের আঁকা ছবিগুলো প্রদর্শন করব।

দেশকে ভালোবেসে দেশের জন্য নিজের প্রান বিলিয়ে দিয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দিয়ে গেছে প্রিয় স্বাধীনতা। সে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নকে বাস্তব করতে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে দেশের জন্য।

হায় রে আমার মনমাতানো দেশ
হায় রে আমার সোনা ফলা মাটি
রূপ দেখে তোর কেন আমার পরান ভরে না।
তোরে এত ভালবাসি তবু পরান ভরেনা

যখন তোর ওই গাঁয়ের ধারে
ঘুঘু ডাকা নিঝুম কোনো দুপুরে
হংসমিথুন ভেসে বেড়ায়
শাপলা ফোটা টলটলে কোন পুকুরে
নয়ন পাখি দিশা হারায়
প্রজাপতির পাখায় পাখায়
অবাক চোখের পলক পড়েনা।

যখন তোর ওই আকাশ নীলে
পাল তুলে যায় সাত সাগরের পশরা
নদীর বুকে হাতছানী দেয়
লক্ষ ঢেউয়ের মানিক জ্বলা ইশারা
হায়রে আমার বুকের মাঝে
হাজার তারের বীণা বাজে
কাজের কথা মনে ধরেনা।

সারা দেশ যখন মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। শিল্পীসমাজ এ যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাদের রংতুলিই তখন হাতিয়ার। মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করাই তখন তাদের কর্তব্য।

মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে ও বহির্বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করাই তখন শিল্পীদের প্রধান কাজ হয়ে উঠে।

কামরুল হাসান

শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে শিল্পী নিতুন কুন্ডু, শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, শিল্পী নাসির বিশ্বাস, শিল্পী প্রাণেশ মন্ডল ও শিল্পী বীরেন সোম কাজ শুরু করেন।

শিল্পী কামরুল হাসান মূলত দুটি পোস্টার করেছিলেন। একটি ছিল রক্তচোষা মুখমন্ডল, হাঁ-করা মুখে দুই দিকে দুটো দানবিক দাঁতে লাল রক্ত ঝরছে। বড় দুটো চোখ আর খাড়া বড় কান, দেখলেই মনে হয় রক্তপায়ী এক দানব।

আরেকটি পোস্টারে ছিল সম্মুখ দিকে তাকানো বড় বড় রক্তচক্ষু, কান দুটো হাতির কানের মতো খাড়া। মুখ কিছুটা বন্ধ। ঠোঁটের দুই দিকে খোলা, দুই দিকে চারটি দাঁত বের করা। দেখেই মনে হয়, দানবরূপী ইয়াহিয়া খানের মুখাবয়ব। পোস্টারটির ভেতর শিল্পীর রূপকল্পনার গভীরতা ছিল, কলম ও তুলির দক্ষ আঁচড় ছিল আর সবচেয়ে মারাত্মকভাবে যা ছিল, তা হলো শত্রুর প্রতি গভীরতম ঘৃণা। এই ঘৃণাই প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার ভেতর সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

এ পোস্টার দুটোর একটি দুই রঙে ও অন্যটি একরঙে করা হয়। দুটো পোস্টারই ছাপিয়ে মুক্তাঞ্চলে বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে যেমন তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের মনে দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

পোস্টারটি পৃথিবীর বহু দেশে পাঠানো হয়েছিল। দেশে-বিদেশে পোস্টার দুটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের এটি যে কত বড় মারণাস্ত্র হয়ে শত্রুকে আঘাত করেছিল, সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এযাবৎকাল যুদ্ধের যত পোস্টার হয়েছে, এতটা ঘৃণা সঞ্চারকারী এবং ক্রোধ উদ্রেককারী দ্বিতীয়টি দেখা যায় না।

মুক্তিযুদ্ধকালে আরও পোস্টার হয়েছিল। সেগুলো হলো: 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার বেদ্ধ, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি', 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'বাংলার মায়েরা মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালির জীবন', 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব'—এ রকম অসংখ্য পোস্টার ও লিফলেট আমাদের প্রথম সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পীদের আঁকা পোস্টার দেখে দর্শক ও মুক্তিযোদ্ধাদের মন আবেগে আপ্লুত হয়েছিল।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নকশাকার শিল্পী কামরুল হাসান। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত। সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক, বৃত্তের লাল রং উদীয়মান সূর্য, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারীদের রক্তের প্রতীক। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার এই রূপটি প্রদান করেন শিল্পী কামরুল হাসান যা ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়।

তবে প্রথম মানচিত্রখচিত পতাকার নকশাটি করেন শিবনারায়ণ দাস। ১৯৭০ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের কক্ষে তৎকালীন ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে নানা আলোচনার পর পতাকার নকশা ও পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়।

আমাদের পতাকা আমাদের সাহস জোগায় দেশের জন্য লড়তে। দেশকে ভালোবাসতে।

শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃতে স্বাধীন দেশের জাতীয় প্রতিকের নকশা হয়। মোহাম্মদ ইদ্রিসের আঁকা ভাসমান শাপলা ও শামসুল আলমের দুই পাশে ধানের শীষবেষ্টিত পাটপাতা ও চারটি তারকা অংশটি মিলিয়ে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের কেন্দ্রে রয়েছে পানিতে ভাসমান একটি শাপলা ফুল যা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। শাপলা ফুলটিকে বেষ্টন করে আছে ধানের দুটি শীষ। চূড়ায় পাটগাছের পরস্পরযুক্ত তিনটি পাতা এবং পাতার উভয় পার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি তারকা। পানি, ধান ও পাট প্রতীকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি। এ তিনটি উপাদানের উপর স্থাপিত জলজ প্রস্ফুটিত শাপলা হলো অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতীক। তারকাগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে জাতির লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

শিল্পী কামরুল হাসানকে পটুয়া কামরুল হাসান নামেও ডাকা হয়। কেন ডাকা হয় তা আমাদের জানা আছে কি? বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি জনপ্রিয় ধারা হল পটচিত্র আর শিল্পী কামরুল হাসান এই ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ছবি আঁকেন তাই তাঁকে পটুয়া নামে ডাকা হয়।

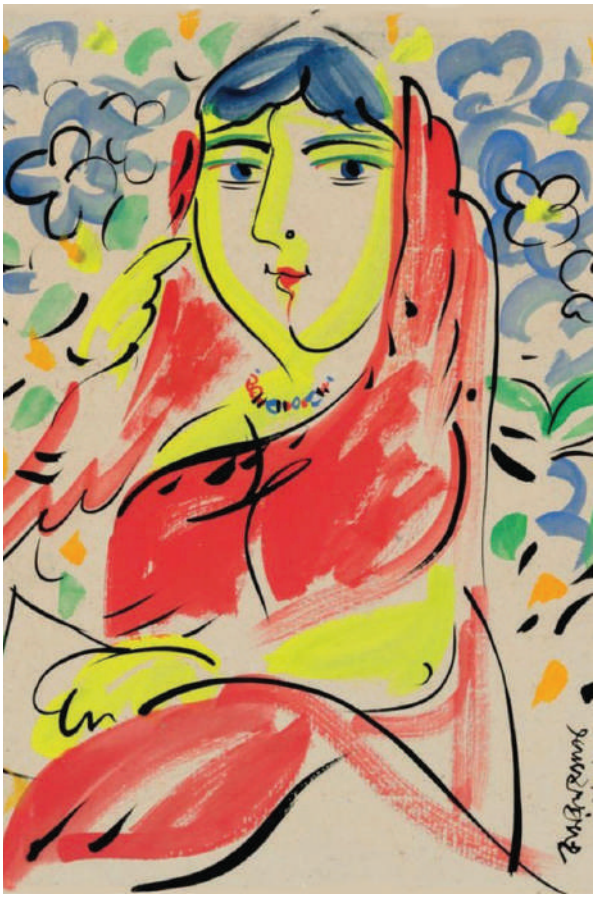

শিল্পী কামরুল হাসান এর কিছু শিল্পকর্ম

যা করব—

- নিজেদের শরীরকে ব্যবহার করে নকশা তৈরি করব।
- হাতে তাল দিয়ে স্বরগুলো অনুশীলন করব।
- স্বাধীনতার পোস্টার- কেমন লাগলো তা নিয়ে সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করব।
- স্বাধীনতা বিষয়ে নিজের মতামত /অনুভূতি বন্ধুখাতায় লিখব।
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী সৃজনশীল লেখার বিষয়ে ধারনণা নিয়ে গল্প/কবিতা/রচনা লিখব ।
- ছবি আঁকার মধ্যদিয়ে নিজের স্বাধীন অনুভূতি প্রকাশ করব।
- শিল্পী কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম সম্পর্কে আরো জানার চেষ্টা করব।

স্বাধীনতা বলতে আমি যা বুঝি তা লিখি-